সামাজিক সুরক্ষায় অর্থায়ন

জনবাজেট প্রতিবেদন : সামাজিক সুরক্ষায় অর্থায়ন

প্রকাশকাল
ঢাকা, জুলাই ২০২০

প্রকাশক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

সম্পাদনা
মনোয়ার মোস্তফা
আমানুর রহমান
সেকেন্দার আলী মিনা
নুরুল আলম মাসুদ

খাতভিত্তিক রচনা ও সম্পাদন
শ্রম ও কর্মসংস্থান : শহিদ উল্লা
কৃষি : নুরুল আলম মাসুদ
প্রতিবন্ধী : আলবার্ট মোল্লা
সামাজিক নিরাপত্তা : মনোয়ার মোস্তফা

প্রকাশনা সহযোগী
একশনএইড বাংলাদেশ

যোগাযোগ
বাড়ি # ৭১৫, সড়ক # ১০, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল : democratic.budget@gmail.com

নি:স্বত্ব
এই প্রকাশনাটি যেকোন অবাণিজ্যিক কাজে যেকোন মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে,
সূত্র উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

মুখবন্ধ

মনোয়ার মোস্তফা
সাধারণ সম্পাদক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

সূচি

১. কোভিড-১৯, শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ ০৪

২. করোনায় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ ০৯

৩. করোনায় অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট প্রত্যাশা ১৫

৪. মহামারিকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ১৯

৫. সাধারণ জনগণের জাতীয় বাজেট ভাবনা :
জাতীয় বাজেট সম্পর্কে মতামত জরিপ ফলাফল ২৫

কোভিড-১৯, শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় বাজেট ২০২০-২১

কোভিড-১৯ মহামারি এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে দুর্দশা, বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা প্রকট করেছে। বর্তমান বিশ্বায়িত দুনিয়ায় কোভিড-১৯ এর আঘাতে বৈশ্বিক এবং দেশজ সরবরাহ চেইন ভেঙ্গে পড়েছে এবং এর সাথে চাহিদার সংকোচনের ফলে উৎপাদনে স্থবিরতা ও মহামন্দার আভাস দেখা যাচ্ছে। মহামারির ফলে একদিকে প্রান্তিক শ্রমজীবিদের উদোম-অরক্ষিত জীবনের ঝুঁকি অপরদিকে জীবিকার অনিশ্চয়তায় শ্রমজীবী মানুষ অজানা আশঙ্কায় দিনযাপন করছে। এ পরিস্থিতির অবসান কবে ঘটবে সে সম্পর্কে নিশ্চতভাবে আগাম কিছু বলা যাচ্ছে না। কোভিড-১৯ মহামারি ঠেকানোর জন্য গৃহিত হঠাত নেমে আসা 'লকডাউন' ও 'সামাজিক দূরত্ব'-এর কৌশলে একদিকে বিপর্যস্ত জীবিকা অপরদিকে জীবিকার সুরাহা না করে অপরিকল্পিত লকডাউন তুলে দিলে জীবন-জীবিকা দুটোই অনিশ্চিত হয়ে যায়।

কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণ প্রকৃতি সৃষ্টি হলেও মহামারি ও মন্দার সমস্যা, বৈশিষ্ট্য ও তীব্রতাজনিত সংকট সামাজিক ও রাজনৈতিক। এটা নির্ভর করছে স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ধরণের ওপর। এর অভিঘাত দেশভেদে যেমন ভিন্ন, সেক্টর বা খাতভেদেও ভিন্ন – এটি ভিন্নভাবে আঘাত হানছে গ্রাম-শহর, প্রবাসী শ্রমিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকায়। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সংকটে রয়েছে চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার রিলিফ সহায়তাসহ নানাধরণের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এ প্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ এবং আসন্ন বাজেট ২০২০-২১ লক্ষ্য করে আলোচ্য অবস্থান-

পত্রে শ্রমজীবীদের জন্য নীতি-কৌশল ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি।

বাংলাদেশের শ্রমখাত মূলত: অনানুষ্ঠানিক ও সেবাখাত নির্ভর। ছয় কোটির বেশি শ্রমশক্তির ৮৫.১% মানুষ অসংগঠিত-অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যার পরিমাণ ৫ কোটি ১৭ লাখ। এরা একাধিক পেশায় নিয়োজিত থাকে। এর মধ্যে বড় অংশ মৌসুমি, স্বনিয়োজিত ও দৈনিক চুক্তিভিত্তিক- যারা সকল প্রকার আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এরমধ্যে কৃষিখাতে নিয়োজিত সবচেয়ে বেশি (৪০.৬%), ২ কোটি ৮ লাখের বেশি, সেবাখাতে রয়েছে (৩৯%%) ১ কোটি ৭০ লাখ শ্রমিক, শিল্পখাতে রয়েছে (২০.৪%) ১ কোটি ১১ লাখ ৬৮ হাজার শ্রমিক। এ ছাড়া প্রবাসে প্রায় ১ কোটি শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন।

কৃষিতে স্থবিরতার ফলে কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কৃষক, যার অভিঘাত পড়ছে কৃষিশ্রমিকের ওপর। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে রপ্তানিমুখি পোষাক শিল্পখাতে। মহামারির এই দুর্যোগের সময়েও রপ্তানিমুখি পোষাক শিল্পেখাতে স্বাস্থ্যঝুকি নিয়ে খোলা হয়েছে কারখানা, এর সাথে ছাটাই ও লেঅফের ঘটনা ঘটছে। প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশ দেশে ফেরত এসে বেকার হয়ে পড়েছেন, অনেকে বিদেশে কাজ হারিয়ে অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে; কোথাও কোথাও মুখোমুখি হচ্ছে খাদ্য সংকটের।

করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারকে ১০ কেজি চাল প্রদান করেছে ও ৫০ লাখ পরিবারকে নগদ এককালীন ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সহায়তা অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। এছাড়া ব্যাংক ঋণনির্ভর স্বল্পসুদের ১৮ টি প্যাকেজ প্রণোদনা হিসাবে মোট ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; প্যাকেজসমূহে ৫ হাজার কোটি টাকা গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন সহায়তা প্রদান ব্যতিরেকে শ্রমিকদের জন্য কোথাও কোন প্রণোদনার প্যাকেজ নেই।

এই প্রেক্ষিতে আগামী বাজেটের লক্ষ্য হবে সকল খাতের শ্রমিকের জন্য মহামারিরকালে নগদ আয়-সহায়তা প্রদান, বিদ্যমান কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাখাতকে দরিদ্র ও শ্রমিকবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শ্রমজীবীদের জন্য আমাদের প্রস্তাবনা:

১. শ্রমজীবী পরিবারের জন্য আগামি এক বছর খাদ্য সহায়তা প্রদান করতে হবে; এজন্য শিশুখাদ্যের সুবিধাসহ রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

২. অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত আড়াই কোটি দরিদ্র শ্রমিক পরিবারকে আগামি ০৬ মাস মাসপ্রতি আট হাজার টাকা বেসিক ইনকাম গ্রান্ট প্রদান করতে হবে;

৩. অবিলম্বে শ্রম আইনের ১২, ১৬, ২০, ২৬ ধারাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করতে হবে যাতে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লেঅফ ঘোষণা থেকে মালিক-গণ বিরত থাকেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিখাত ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-কারখানায় কোন প্রকার শ্রমিক-কর্মচারি ছাঁটাই চলবে না, করোন-াকালীন সময়ে শ্রমিকদের অন্তত ০৩ মাস পূর্ণ বেতন দিতে হবে;

৪. কোভিড পরিস্থিতিতে কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়া কাউকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কোভিডকালীন সময়ে কাজে যোগ দেওয়া সকল শ্রমিক-কর্মচারিকে ঝুঁকিভাতা প্রদান করতে হবে;

৫. কোন শ্রমিকের করোনা লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র তাকে কোভিডসংক্রান্ত পরীক্ষা, উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ও আনুসাঙ্গিক সুবিধা ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনতে হবে;

৬. কোভিড পরিস্থিতিতে কাজে যোগ দেওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তার পরিবারের দায়িত্ব মালিককে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;

৭. সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে; এ লক্ষ্যে জাতীয় পেশাজীবী শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও শ্রমজীবী নিবন্ধন করে জাতীয় পেনশন স্কিম চালু করতে হবে। এজন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

৮. শ্রমজীবীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে সরকার কর্তৃক শ্রমিক বন্ড চালু করার ব্যবস্থা নিতে পারে, সামাজিক বীমার প্রচলন করতে হবে;

৯. নারীশ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

১০. রপ্তানিমুখী শিল্প-শ্রমিকের বেতন পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সরকারি

প্রণোদনা/ ঋণ-সহায়তা সরাসরি প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে;

১১. শ্রমজীবীর জন্য বিশেষ হাসপাতাল চালু করা, তার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক হাসপাতালে শ্রমজীবীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সেবার সময় নির্ধারণ করতে হবে;

১২. ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভান্ডার তৈরি, পুনরায় বিদেশ প্রেরণে সহায়তা অথবা পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

১৩. কৃষিশ্রমিক, কৃষিতে স্ব-নিয়োজিত বর্গাচাষীদের জন্য উপকরণ সহায়তা, উৎপাদিত পণ্যে নগদ ভর্তুকি প্রদানসহ কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

১৪. শিল্পাঞ্চলগুলোতে 'শিল্প শ্রমিক আবাসন এলাকা' ঘোষণা করে বাড়িভাড়া মূল্য নির্ধারণ ও তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িওয়া-লাদের হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা স্বল্প ব্যয়ে ভাড়ায় থাকতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্রেতা/ ব্রান্ডের কাছে দাবি

১. ক্রেতা ও ব্রান্ড কর্তৃক করোনাকালীন সময়ে দেশের গার্মেন্টসগুলোর কোন কার্যাদেশ বাতিল করা যাবে না। সিএম প্রাইস কমানো যাবে না।

২. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় কল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য কেন্দ্রিয় তহবিলে ক্রেতা কর্তৃক অনুদান প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

করোনায় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত জাতীয় বাজেট ২০২০-২১

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং তারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বাংলাদেশের এখনো শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ গ্রামীণ মানুষের আয়ের উৎস কৃষি। দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার কৃষি ও অকৃষিজ উভয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। শহরে বসবাসকারীদের মধ্যেও ১১ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজে যুক্ত। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে । দেশের সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল ব্যক্তিখাত হিসেবে কৃষিখাত জিডিপিতে প্রায় ১৩.৭ শতাংশ অবদান রাখে। শতকরা হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনমূল্যে কৃষির অংশীদারিত্ব কমলে জাতীয় পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে কৃষির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে; গ্রামীণ এলাকার ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের প্রধান উৎসও কৃষি। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:সম্পর্কিত ক্ষেত্র- যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট।

কৃষি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল ব্যক্তিখাত। কিন্ত, কিন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি অবহেলিত থাকছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদানের ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই সময়কালে শিল্প এবং সেবাখাত যেমন বিকশিত হয়েছে, পাশাপাশি এর মধ্যদিয়ে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় অবিচ্ছিন্ন মনোযোগের অভাব, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবসায়ী গ্রুপের প্রভাব বিস্তার এবং নীতি-প্রণয়ন পর্যায়ে কৃষকদের স্বার্থ

সুরক্ষায় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন না থাকার মতো কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার দ্রুত হারে বাড়লেও জাতীয় বাজেটে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট খাতের বাজেট ক্রমহ্রাসমান।মোট বাজেটে আনুপাতিক হারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রতি বছর নিয়মিত হারে কমছে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিলো মোট বাজেটের ৮.৪৪ শতাংশ, আর ২০২০ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ২.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চলতি বছর করোনা মহামারীর ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশেও। আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি আমাদের কৃষিখাত। মার্চের শুরুতে যখন প্রথম নভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের খবর সরকারিভাবেঘোষিত হয়, তখন ছিল ভরা বোরো মৌসুম। শীতকালীন অনেক ফসল উঠে গেলেও কিছু ফসল তখনো মাঠে ছিলো। কৃষি মন্ত্রনালয়ের হিসাব মতে, এপ্রিল ও মে মাসে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন কৃষিপণ্য বাজারে আসে এবং কৃষকদের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় মৌসুম। টানা লগডাউন, হাটবাজার বন্ধ এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে গিয়ে কৃষক উৎপাদিত পণ্য পানির দামে বেচে দেয়; গণমাধ্যম বলছে, শশা,বেগুণ, শিম, টমেটো দ্রুত পচনশীল বলে এগুলো সাধারণ-দামের ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ (শশা ৩-৫ টাকা,বেগুণ ৫ টাকা) কম দামে বিক্রি করে কৃষক ।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আলু তোলার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে থাকার কারণে ১০৮ লাখ টন আলু তোলার যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তার মধ্যে ৯৭ দশমিক ৬ লাখ টন তোলা হয়েছে। তবে পেঁয়াজ তোলার সময়ে লকডাউন শুরু হওয়ার কারণে ২৩ দশমিক ৮ লাখ টন পেঁয়াজের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তোলা হয়েছে মাত্র ৯ দশমিক ৭৩ লাখ টন।

গত ৭ এপ্রিল জেলা প্রশাসকদের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই যে করোনা প্রভাব, এতে ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাব দেখা দেবে বিশ্বব্যাপী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সে রকম অবস্থা হতে পারে।’ খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি দেখলে গেলে সেক্ষেত্রে মৎস্য, ডেইরি ও পোল্টিখাতও এই সাথেযোগ করতে হবে। বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিডিএফএ) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘বর্তমান

পরিস্থিতিতে প্রতিদিন ১৫০ লাখ লিটার দুধ অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫৭ কোটি টাকা। আগামী এক মাস এভাবে চলতে থাকলে প্রায় ১ হাজার ৭১০ কোটি টাকার ক্ষতির মধ্যে পড়বেন খামারিরা।

পোলট্রি খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, মার্চের শেষের দিকে এসে পোল্ট্রি খাতে বড় ধরনের সংকট টের পাওয়া যায়। প্রতিদিন দেশে ৩ হাজার ২৭ টন মুরগির মাংস উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু ৭০ শতাংশ মুরগি অবিক্রীত থাকছে। ফলে দিনে প্রায় ২১ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিদিন ৪ কোটি ৬৬ লাখ ডিম উৎপাদন হচ্ছে; কিন্তু ডিম বিক্রি ৬০ শতাংশ কমে গেছে। এজন্য ১৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি একদিনের বাচ্চাও ৯০ শতাংশ বিক্রি হচ্ছে না এবং পোল্ট্রি খাদ্য ৭০ শতাংশ বিক্রি কমে গেছে। বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিলের (বিপিআইসিসি) তথ্য অনুযায়ী, পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ রয়েছে। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য –অর্থনীতি ইনস্টিট্যুটের হিসাবে করোনাকালীন সময়ে শষ্য উৎপাদন, প্রাণীসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদখাতে প্রতিদিন ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে ।

চলতি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে কৃষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে গত ১২ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা দেন। প্রথমত: এই প্রণোদনা কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোন অনুদান বা আর্থিক সহায়তা নয়। এটি কৃষিখাতে ৪% সুদে ঋণ (এটি প্রথমে ৫ শতাংশ ছিল, পরে ৪ শতাংশ করা হয়েছে)। এই প্রণোদনাটির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক "কৃষিখাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম" গঠন করে একটা সার্কুলার জারি করেছে। তাতে দেখা যায়, মূলত: প্রাতিষ্ঠানিক কৃষকদের সহায়তা করবে। কিন্তু প্রচলতি ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই প্রণোদনা থেকে বর্গাচাষী, অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষি কাজ করেন বা কৃষিসমন্ধীয় কাজ করেন এমন কৃষকরা কোন সহায়তা পাবেন না।

প্রধানমন্ত্রী ১২ এপ্রিল জানান, আগামি বাজেটে সারের ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত তিন বছর ধরেই বাজেটে সমপরিমাণ অর্থ কৃষিভর্তুকি হিসেবে রাখা হচ্ছে। কিন্তু, সংশোধতি বাজেটে দেখা যায়,

বরাদ্দকৃত টাকা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অব্যবহৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, ৫ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা এবং ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা অব্যবহৃত ছিল।

পিপিআরসি ও বিআইজিডি গবেষণা বলছে, করোনার বিপর্যয় ঠেকাতে দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে লকডাউনের ফলে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে দরিদ্র-অতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে। এই সময়ে দেশে নতুন করে ৩ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার (২২.৯%) মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে সবমিলিয়ে প্রায় ৭ কোটি মানুষ দারিদ্র্য অবস্থার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

বাংলাদেশে ৬ কোটির বেশি শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫.১ শতাংশ অসংগঠিত-অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যাদে সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ১৭ লাখ। লকডাউনের কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, এই অবস্থা চলতে থাকলে চলতি অর্থবছরে ১% এর বেশি প্রবৃদ্ধি হারাবে বাংলাদেশ এবং চাকরি হারাবে অন্তত: ৯ লাখ মানুষ ।

খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলতেও নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা দিক থেকে বাংলাদেশ সবসময় একটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিলো। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সূচক ২০১৯' অনুসারে বিশ্বের ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৩তম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। এই প্রতিবেদন বলছে, ১০০-র মধ্যে ২৫.৮ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশে মারাত্মক মাত্রায় ক্ষুধার সংকটে রয়েছে ।

পিআরসি ও বিআইজিডির হিসাব মতে, করোনাকালীন সময়ে দেশে শহরাঞ্চলে মানুষের ৪৭ শতাংশ ও গ্রামের মানুষের ৩২ শতাংশ খাবারের পরিমাণ কমেছে। সরকারি তথ্য মোতাবেকই দেশের প্রায় পৌনে ৪ কোটি মানুষ (দরিদ্র ২১.৮ শতাংশ) পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ করতে পারতেন না। আর প্রায় ২ কোটির (অতি দরিদ্র ১১.৩ শতাংশ) কাছাকাছি মানুষ পর্যাপ্ত খাবার কেনার জন্য প্রয়োজনীয় আয় করতে পারতেন না। তার মানে, খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্কট আগ থেকেই ছিলো । করোনাভাইরাস দুর্যোগ আমাদের এই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিকে আরও ঘনীভূত এবং দীর্ঘমেয়াদী করবে।

দুই হাজার ৬৭৫ জনের ওপর পরিচালিত ব্র্যাকের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, জরিপকালীন ১৪ ভাগ মানুষের ঘরে কোনো খাবার ছিল না। ২৯ ভাগের ঘরে ছিল এক থেকে তিন দিনের খাবার–এর তথ্য সেই ইঙ্গিতই বহন করছে।

এত বিপদাপদের বিপরীতে, টানা লকডাউন আর সাধারণ ছুটির ফলে শিল্প ও সেবা খাত যখন ভেঙে পড়েছে তখন আশা দেখাচ্ছে কৃষিখাত। আসন্ন জাতীয় বাজেটে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবনা :

১. কৃষিখাতকে আগামি বাজেটে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। করোনায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলায় ও বিপদাপন্ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরকারি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২. বিগত বছরগুলোর মতো সারের ভর্তুকির নামে ৯০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পানি,সেচ, বীজ, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদিও জন্য নগদ অর্থে ভর্তুকি প্রদান করা; এবং ভর্তুকির অর্থ সরাসরি কৃষকের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ওয়ালেটে প্রেরণ করা;

৩. মহামারীতে সৃষ্ট 'নতুন দরিদ্র', প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বেকার এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কৃষিতে কর্মসংস্থান তৈরিতে সকল বেদখলকৃত জমি উদ্ধার করা এবং কৃষিজমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা;তরুণ ও ক্ষুদ্র কৃষির উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা;

৪. করোনাপরবর্তী সময়ে এক বছর সরকারিভাবে খাদ্য সহায়তা চালু রাখা। খাদ্য ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এসএসএনপি'র আওতায় গৃহীত অতিরিক্ত পরিবারগুলির খাদ্য সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সামঞ্জস্য করার জন্য এই অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

৫. কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধারণে একটি জাতীয় মূল্য কমিশন গঠন করা। ধানের আগাম মূল্য ঘোষণা করা, কৃষক ও অন্য ক্ষুদ্র উৎপাদককে ধান–চাল ক্রয়ে 'নুন্যতম মূল্য সহায়তা' প্রদান করা;

৬. কৃষি জন্য ঘোষিত প্রণোদনায় 'কৃষি–উদ্যোক্তাদের জন্য' সুদের হার সবোর্চ্চ ২ শতাংশ করা। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক– যারা সবজি, ফল–ফলাদি, পোল্ট্রি ও ড়েইরি চাষীদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা।

৭. সব্জি, ফলমূল, দুধ সহ পচনশীল পণ্য পরিবহনে ফ্রিজিং ভ্যানের ওপর শুল্ক হ্রাস করা। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও কমিউনিটি হিমাগার তৈরিতে সুদবিহীন আর্থিক সহায়তা/ বৃত্তি প্রদান করা;

৮. সরকার উৎপাদিত ধানের মাত্র ১০ শতাংশের মতো ক্রয় করে থাকে। সরকার প্রয়োজনে ধান কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষণের জন্য নতুন কৌশল অনুসন্ধান করতে পারে। ধানক্রয়ে লটারি সিস্টেম বাতিল করা, ধান সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত কৃষকদের তালিকা উন্মুক্তস্থানে প্রকাশ করা এবং মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য ক্রয়ে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা;

৯. জাতীয়ভাবে ক্ষুদ্র-কৃষক-উপযোগী শস্যবীমা চালু করা; ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক-কৃষকদের মৌসুমভিত্তিক শষ্যঋণ /কৃষিঋণ প্রদান করা।

১০. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য লক ডাউনকালে এবং পরবর্তীতে ৬ মাস খাদ্য সহায়তা চালু রাখা। কৃষিপ্রণোদনার টাকা থেকে বর্গাচাষী ও কৃষিশ্রমিকদেও নগদ খোরাকি-প্রণোদনা প্রদান করা।

১১. কৃষিপণ্য পরিবহণে রেলে ফ্রিজিং কম্পার্টমেন্ট চালু করা। উত্তারাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে কৃষি পণ্য পরিবহণে সরাসরিট্রেন সার্ভিস চালু করা;

১২. করোনাকালে কৃষি পণ্য সরবরাহের জন্য যে সকল বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল নতুন স্বাভাবিকতা'য় পরিস্থিতিতে এই সকল ইনোভেশানের সম্প্রসারণ করতে হবে। ডিজিটাল বাজার [কৃষিপণ্য সরাসরি কৃষক যেন পাইকারের কাছে বিক্রি করতে পারে, বা পাইকার যেন সরাসরি উৎপাদককে যোগাযোগ করতে পারে। অথবা, ভোক্তা সরাসরি কৃষককে ফোন দিচ্ছেন এবং মোবাইল ওয়ালেটে মূল্য পরিশোধ করছেন]।

১৩. আসন্ন বাজেটে বীজ আমদানি বাবদ বরাদ্দকৃত ১৫০ কোটি টাকা থেকে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে নারীকৃষকদের 'বীজ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ' সহায়তা প্রদান করা এবং পারিবারিক কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

১৪. কৃষিকে জোরদার অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিক বাস্তবায়ন, অতিরিক্ত তহবিলের যোগান দেওয়া; ও ২০২১ অর্থবছরের মোট বাজেটের কমপক্ষে ০৫ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ দেওয়ার জোর দাবি জানাই।

করোনায় অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট প্রত্যাশা

ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় পর্যায়ের বাজেট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ধারাবাহিকতায় চলতি বছর "জাতীয় বাজেট ২০২০-২১: করোনায় অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট প্রত্যাশা" শিরোনামে একটি ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে।

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বর্তমান অবস্থা

- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। অথচ পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তারমধ্যে জনশুমারি ২০১১ মোতাবেক মোট জনগোষ্ঠির ১.৪১%, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুসারে ৯.০৭%, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুসারে ৬.৯৪% এবং প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ (২৬ মে ২০২০) ১৮ লাখ ৮৭৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে ।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে শক্তিশালী আইনী কাঠামো রয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটে প্রতিফলন থাকছে না। জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামতের প্রতিফলন ও কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না।

- কোভিড মহামারী মোকাবিলায় সরকার যে সকল সুবিধা প্রদান করছে সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবছর যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। যেমন, চলতি অর্থবছরে সামাজিক

নিরাপত্তা বেষ্টনি খাতের বাজেট মোট বাজেটের ১৪.২১% এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর খাতের বাজেটের মাত্র ২.১৯%, যা মোট বাজেটের মাত্র ০.৩১ শতাংশ।

- ১৩২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ১০টি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখা হয়ে থাকে। এর মধ্যে ২টি সরাসরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

- প্রবেশগম্যতা, অসচেতনতা, বৈষম্য ইত্যাদির কারণে মানব উন্নয়নের মৌলিক সেবায় যেমন- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রীতিবদ্ধভাবে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে না।

২. রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি কিভাবে কোভিড উপযোগী করে ব্যবহার করা যায়?

- করোনার কারণে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুর্নবিন্যাস হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কিভাবে খাপ খাওয়াবে সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যেমন- খাদ্য সহায়তা, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিক বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে গৃহিত প্রকল্পগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

- কর্মে নিয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা করোনার কারণে চাকুরি হারাবে। সুতরাং তাদের জন্য নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন তাদের জন্য উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও তা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে নিশ্চিত করা।

৩.সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাবনা

১. সকল অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের খাদ্য প্রণোদনা হিসেবে আগামি এক বছরের খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা করা;

২. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা জনপ্রতি মাসিক ন্যূনতম ১৫০০ টাকায় উন্নীত করা;

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা;

৪. করোনায় যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকরি হারাবে এবং যারা বেকার অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা; বেকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা;

৫. কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পেনশন স্কিম চালু করা;

৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির পরিধি বৃদ্ধি ও তাদের অগ্রাধিকার প্রদানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান;

৭. গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেমন- সেরিব্রাল পলসি, অটিজন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, ডাউন সিনড্রোম, মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাদের সার্বক্ষণিক যত্নের প্রয়োজন হয় সেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেয়ারগিভারের জন্য মাসিক-ভিত্তিতে ২ হাজার ৫০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা;

৮. সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৯. অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী (Accessible) করতে বাজেট বরাদ্দ রাখা;

১০. করোনার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনরায় কর্মে যুক্ত করতে নতুন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে অ্যাসেসটিভ টেকনোলজি ফান্ড, ইনফরমেশন অ্যাকসেসিবিলিটি ফান্ড গঠনে বাজেট বরাদ্দ রাখা;

১১. সকল আশ্রয়কেন্দ্র, ভৌত অবকাঠামো, বাস স্ট্যান্ড, নৌ-টার্মিনাল, ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম সহ সকল গণসেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করতে বাজেট বরাদ্দ করা;

১২. যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সেক্ষেত্রে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী ও প্রবেশগম্য করা; সেইসাথে প্রতিবন্ধী নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা;

১৩. কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সচেতনতার তৈরিতে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা;

১৪. প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৫% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ রাখা;

১৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে আইন ও জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকা;

১৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা– বিশেষভাবে নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, কোভিড কালে প্রায়শই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সহিংসতার শিকার নারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা।

শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোক্তা/ মালিক পক্ষের কাছে দাবি

১. বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিখাত ও রাষ্টায়ত্ত শিল্পকারখানায় কোন প্রতিবন্ধী কর্মীকে ছাঁটাই করা যাবে না;

২. করোনাকালীন প্রতিবন্ধী কর্মীকে পূর্ণ বেতন দিতে হবে;

৩. করোনাকালীন কাজে যোগ দেয়া সকল প্রতিবন্ধী কর্মীকে ঝুঁকিভাতা/ হার্ডশিপ এলাউন্স প্রদান করতে হবে;

৪. সকল প্রতিবন্ধী কর্মীকে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনতে হবে।

৫. কোভিড পরিস্থিতিতে কাজে যোগ দেয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী কর্মী ও তার পরিবারের দায়িত্ব মালিকদের বহন করতে

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কাছে দাবি

১. করোনার সময়ে কোন উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প বাতিল করা যাবে না। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধ্য করা যাবে না;

২. যেসব প্রকল্প বা প্রকল্পের কিছু কাজ কোভিড মোকাবিলায় স্থানান্তর করা হচ্ছে সেখানেপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৩. কোভিড সংক্রান্ত বিশেষ প্রকল্প কিংবা অন্য যেকোন নতুন প্রকল্প পরিকল্পনায় যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

মহামারিকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট

বাংলাদেশে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি" বা Social Safety Net Program নামে একাধিক ছোট-বড় প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২৩টিরও বেশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এগুলি বাস্তবায়ন করছে। দেশে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ ধরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে, আমাদের মূল বাজেট কাঠামো বা দলিলে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি" নামে বিশেষ কোন খাত নেই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে সব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলির সমষ্টিকেই "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি" নাম দেওয়া হয়। এটি মূল বাজেট দলিলের অংশ নয়; এমনকি বাজেট সংক্রান্ত যে সমস্ত দলিলপত্র ছাপানো হয়, সেখানে এটি পাওয়া যায় না। মূলত: অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এইসব প্রকল্প ও কর্মসূচির একটি তালিকা (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুত করে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এইসব প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলির তালিকা বাস্তবায়নকারী স্ব স্ব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট দলিল ও ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়।

সরকারি দলিলপত্রে বলা হয়ে থাকে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাস করা। নীতি নির্ধারকরাও সব সময় এই কথাটিই উল্লেখ করে থাকেন। তবে বিগত দু'দশক ধরে এই কর্মসূচিগুলির চরিত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনে ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। তবে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি, অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলি তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। ৭ম পঞ্চ বার্ষিক

পরিকল্পনায়ও বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কিত একাধিক 'ইস্যু' ও 'চ্যালেঞ্জ' চিহ্নিত করে কর্মসূচিগুলিকে আরো সুসংহত ও কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মূলত: একটি সামগ্রিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার নিরিখে ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে ২০১৫ সালে সরকারের উদ্যোগে National Social Security Strategy (NSSS) তৈরি করা হয়। এই নীতিপত্রের আলোকে ৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২১) একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কিন্তু চলমান "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি" কর্মসূচিতে এর কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না।

জাতীয় বাজেট বরাদ্দের ধারা

চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি'র অধীনে এ ধরণের প্রকল্প ও কর্মসূচির সংখ্যা মোট ১৩২টি। মোট বরাদ্দ ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫৮ শতাংশ।

লেখচিত্র ১ : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দের ধারা (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০)

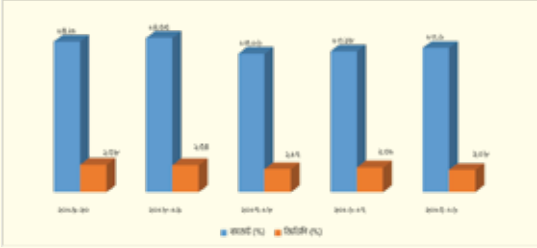

সরকারি দলিলপত্রে অবশ্য একথা স্বীকার করা হয় যে, দেশীয় বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আমাদের বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল। বরাদ্দের দিকে দিয়ে বিবেচনায় করলে প্রতিবছর এই খাতে বরাদ্দ ধীর গতিতে হলেও বাড়ছে। কিন্তু বিদ্যমান নিরপত্তা বেষ্টনির মধ্যে ৪টি বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলে থাকেন। বিশেষ করে ১."সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা", ২. "মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা", ৩. "যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা" ও ৪. "শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন"- এই চারটি কর্মসূচিকে কী যুক্তিতে নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনা হয়েছে- তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের

পেনশন তাদের "প্রাপ্য"র অংশ হিসেবে বিবেচ্য। আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য "সম্মানী" কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কি দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হতে পারে? লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- এই ৪টি কর্মসূচিই গোটা নিরাপত্তা কর্মসূচির ৩৫-৪০ শতাংশ। কিন্তু, এগুলির বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কারণে বিদ্যমান কর্মসূচির বাইরে রাখলে টাকার অংকে "প্রকৃত" নিরাপত্তা বেষ্টনির আকার অনেক ছোট হয়ে যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির ধরণ

লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় কর্মসূচিগুলিকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের বিবেচনায়- দু'টি ক্যাটেগরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ১. বিভিন্ন ধরণের নগদ সহায়তা (ভাতা, উপবৃত্তি ইত্যাদি) ও ২. খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহ।

লেখচিত্র ২ : কর্মসূচির ধরণ ও সামাজিক নিরাপত্তায়
মোট বরাদ্দের শতকরা হার (২০১৯-২০)

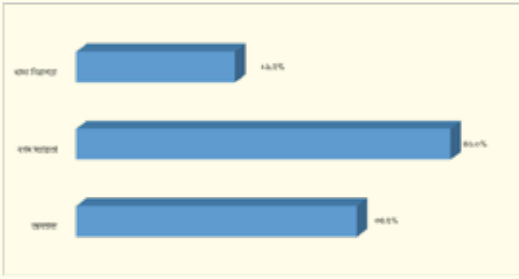

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নগদ সহায়তা সম্পর্কিত মোট ১৯টি কর্মসূচির মধ্যে ওপরে উল্লেখিত ৪টি বিশেষ কর্মসূচিও যুক্ত হয়ে আছে। সেগুলোকে হিসাবের বাইরে রাখলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নগদ সহায়তার শতকরা হার নেমে আসে মাত্র ৯.৭৮ শতাংশে। এই ৯.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ৭ হাজার ২৭২.৭৪ কোটি টাকা নগদ সহায়তা হিসেবে সাধারণ দরিদ্র পরিবারগুলোকে দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে আরো এমন সব ছোট ছোট প্রকল্প ও কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেগুলোর সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের সরাসরি কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়েও

প্রশ্ন তোলা যায়। ফলে গোটা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিকে নতুন করে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

করোনা মহামারিকালে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি" কর্মসূচি

করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। দরিদ্র, বয়স্ক, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ নানাভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘরবন্দি এসব মানুষের জীবন-জীবিকা থমকে গেছে।

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ দরিদ্র মানুষ আছে। গড়ে ৫ সদস্যের পরিবার হিসাব করলে কাগজে-কলমে মোট ৬৬ লক্ষ দরিদ্র পরিবার রয়েছে। কিন্তু বিগত আড়াই মাসে আরো কতো পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছে সে সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত বহু পরিবারও হয়তো দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে গেছে অথবা দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ গত আড়াই মাসে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বহু মানুষ তাদের চাকরি বা কাজ হারিয়েছে। চাকরি ও কাজের বাইরে অনেক পরিবারের অন্যান্য নানান উৎস থেকে স্বাভাবিক আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ পর্বেক্ষণেরভিত্তিতে এরকম ধারণা করা অমূলক নয় যে, দেড় কোটির কাছাকাছি পরিবার অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বিপদাপন্ন সম্ভবত ৭৫ লক্ষ পরিবার যারা হতদরিদ্রের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলোর চেয়ে শহরে পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছে। গ্রামে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করার সামান্য সুযোগ থাকলেও শহরে কাজের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সুযোগ-সুবিধা এমনিতেই শহরের চেয়ে গ্রামেরই বেশি সম্প্রসারিত। অর্থনীতির চাকা কবে নাগাদ চালু হতে পারে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

ফলে এবারের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিকে সাজাতে হবে এই দেড় কোটি দরিদ্র পরিবারের সংকটকে মাথায় রেখে। আমাদের মনে রাখা দরকার, এসব পরিবারের আপাত: সস্ত শ্রমই আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। এর মধ্যেই রয়েছে দরিদ্র্য কৃষিভিত্তিক পরিবার ও শহুরে তৈরি

পোষাক খাত, নির্মাণশ্রমিকসহ স্বল্প আয়ের নানা শহুরে পেশার শ্রমিক পরিবার।

এই প্রেক্ষাপটে, আমরা মনে করি এবারের বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি" খাতটি গুরুত্ব ও অর্থ বরাদ্দের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দাবি করছে। এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবনা :

১. মহামারিকালীন সময়ে এবং আগামি অর্থবছর জুড়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর দু'টি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে: ১. নগদ সহায়তা কর্মসূচি ও ২. খাদ্য নিরাপত্তা সংশিষ্ট কর্মসূচি।

২. করোনা মহামারিকালীন এই দুযোগে ১.৫ কোটি দরিদ্র্য পরিবারের জন্য "বিশেষ নগদ সহায়তা" কর্মসূচি নামে একটি আপদকালীন কর্মসূচি চালু করতে হবে। আগামি ৬ মাস প্রতিটি পরিবারকে মাসে কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দিতে হবে। এজন্য খরচ হবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। আমরা এই কর্মসূচির জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। কোন ধরণের মধ্য-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মোবাইলের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে এই টাকা পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির বহু এডহক প্রকল্প/কর্মসূচি আপাতত: স্থগিত রেখে সেই অর্থ প্রস্তাবিত তহবিলে হস্তান্তরের প্রস্তাব রাখছি।

৩. বিদ্যমান নানা ধরণের নগদ সহায়তা (উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরণের ভাতা) কর্মসূচিগুলিকে চালু রাখার পাশাপাশি ভাতার পরিমাণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. ছোট-বড় সব শহরেই নগদ সহায়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা সংশিষ্ট কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে।

৫. চলতি অর্থবছর থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্পের তালিকা থেকেঅবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের পেনশন, মুক্তিযোদ্ধাদের "সম্মানী"সহ মোট ৪টি কর্মসূচি অন্যত্র আলাদাভাবে প্রদর্শনের প্রস্তাব করছি। এই ৪টি কর্মসূচির বাইরে যা থাকবে সেটিই মূলত: "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি" খাতে বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাতে চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে মোট বরাদ্দ ৪৭ হাজার ৪৪০.৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৯.০৬% এবং জিডিপি'র ১.৬%।

৬. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগিয়ে এ ধরণের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদানের মূল ভূমিকা পালন করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ; জেলা উপজেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলি শুধুমাত্র তদারকি ও পরিবীক্ষণের কাজ করবে।

৮. প্রতিটি স্থানীয় সরকারকে তাদের স্ব স্ব এলাকার জন্য একটি চাহিদাভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা সেবার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এটাই হবে "বেইজলাইন"। প্রতি বছর এই বেইজলাইন আপডেট করতে হবে। বেইজ লাইনেরভিত্তিতে সেবার চাহিদা ও যোগানের নিরিখে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে।

৯. National Social Security Strategy ও এ সম্পর্কিত ইতোমধ্যে গৃহিত 'অ্যাকশন প্লান' অনুসরণ করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিদ্যমান কাঠামো বদল করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ১. বিদ্যমান কর্মসূচির সংখ্যা কমিয়ে অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচিকে একত্রিত করে স্বল্প সংখ্যক কর্মসূচিতে রূপ দিতে হবে, ২. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে, ৩. নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডারে তৈরি করে উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতি আনতে হবে।

সাধারণ জনগণের জাতীয় বাজেট ভাবনা
জাতীয় বাজেট সম্পর্কে মতামত জরিপ ফলাফল

বাজেটকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে শতাধিক নাগরিক সংগঠনের প্লাটফর্ম 'গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন' এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম (যেমন- সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি) পরিচালনা করছে। কিন্তু চলমান কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনমত গ্রহণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "সাধারণ জনগণের জাতীয় বাজেট ভাবনা" বিষয়ক এই প্রযুক্তি-ভিত্তিক জরিপটি পরিচালিত হয়েছে। স্বল্প অর্থায়নে পরিচালিত এ জরিপে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে প্রচলিত বাজেট প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে তাদের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

জরিপের উদ্দেশ্য
জাতীয় বাজেটে জনগণের সম্পৃক্ততা, তথ্য, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণ বিষয়ে জনমত তৈরি করা।

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনা
জাতীয় বাজেট সম্পর্কে জানে এবং এ বিষয়ে মতামত দিতে আগ্রহী যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক।

নমুনা কাঠামো
দেশের ৮ টি প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এমন ৬০০০ মোবাইলফোন নম্বর সম্বলিত পুল তৈরি

পদ্ধতি ও নমুনা আকার
দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ। ৯৫% আত্মবিশ্বাসের স্তরে (Confidence

দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ। ৯৫% আত্মবিশ্বাসের স্তরে (Confidence level) এবং ০৫% সহনশীলতায় (Tolerance) অসীম জনসংখ্যার জন্য নমুনার আকার ৩৮৪ জন হলেই গ্রহণযোগ্য হয়। এ জরিপে ৪১১ জন উত্তরদাতার যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে যার ৬৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৩১ শতাংশ নারী।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

- মোবাইলফোনে টেলি-জরিপ;
- কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত প্রশ্নপত্র ;
- ফোন কল করে আগ্রহী এবং উপযুক্ত উত্তরদাতা খুঁজে নেওয়া হয়েছে;
- মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে বর্ণনামূলক এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ।

বাজেটে সাধারণ জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন

- মাত্র ৯.৫% উত্তরদাতা মনে করেন প্রতিফলন থাকে।
- ৫৪.৬% উত্তরদাতা মনে করেন যে মোটামুটি প্রতিফলন থাকে।
- তবে ৩৩.৯% বলেন জনগণের প্রত্যাশা একেবারেই প্রতিফলন থাকে না।

বর্তমান বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বার্থ সংরক্ষণ, উপেক্ষা ও গুরুত্ব

বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেন যে, বর্তমান বাজেট প্রক্রিয়ায় নিম্নবিত্ত, দরিদ্র, দিনমজুর, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, কৃষিজিবী, সাধারণ চাকুরিজীবী ও সাধারণ জনগণের স্বার্থ সবচাইতে বেশি উপেক্ষিত হয়। এবং উচ্চবিত্ত, ক্ষমতাশীল, পুঁজিবাদী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থ বেশি মাত্রায় সংরক্ষিত হয়।

- সবচেয়ে বেশি (৬৫.৪%) উত্তরদাতা মনে করেন বাজেটে কৃষিজীবীদের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

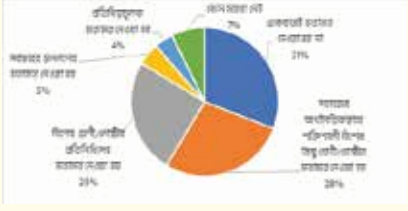

- এছাড়াও উত্তরদাতাদের মতামতে শ্রমজীবী, জেলে, তাঁতী, চাকুরিজীবী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও মৎসজীবীদের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

- ৩১% জনগণ মনে করেন একেবারেই মতামত নেওয়া হয়না।
- ২৮% মনে করেন সমাজের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বিশেষ কিছু শ্রেণী/ গোষ্ঠীর মতামত নেওয়া হয়।
- ২৫% মনে করেন উল্লেখিত শ্রেণী/ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই মতামত দিয়ে থাকেন।

বাজেটে জনঅংশগ্রহণের প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও পরামর্শ

- ৮০% উত্তরদাতা মনে করেন, জেলাভিত্তিক বাজেটের আলোকে জাতীয় বাজেট করা উচিত।
- ৭৮% জনগণই মনে করেন, নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বাজেটের বরাদ্দ করা বা আলাদা খাত হিসাবে দেখানো উচিত।

আগামী বাজেটে জনপ্রত্যাশা

আগামী বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে সুষম ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা উচিত

- ১ম অগ্রাধিকার কৃষিখাত
- দ্বিতীয় অগ্রাধিকার স্বাস্থ্যখাত
- তৃতীয় অগ্রাধিকার শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাত

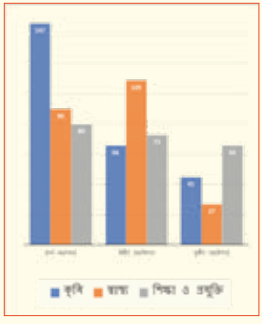

- ৫৫.৬% জনগণই মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌছানো বা সেটির সুফল পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট না।
- ২৭.৭% জনগণ এটিকে মোটামোটি যথেষ্ট ভাবেন।
- ১ ৪.৫% যথেষ্ঠ মনে করেন না; আর ২.২% মানুষ কোন মন্তব্য করেন নি।

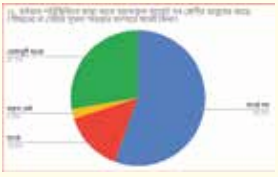

জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের দাবি

- জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের দাবিগুলোর মধ্যে প্রথম অগ্রাধিকার(৭৬.৩%) হলো- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভর্তুকির অর্থ সরাসরি কৃষকের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ওয়ালেটে প্রেরণ করা।

- দ্বিতীয় অগ্রাধিকার (৬৬.৯%) হলো- কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধারণে একটি জাতীয় মূল্য কমিশন গঠন করা।
- তৃতীয় অগ্রাধিকার (৫৬.৩%) - কৃষিপণ্য পরিবহণে রেলের মালবাহী বগি ব্যবহার ও ফ্রিজিং কম্পার্টমেন্ট চালু করা।
- ৪০.৭% উত্তরদাতা মনে করেন- কৃষির জন্য ঘোষিত প্রণোদনা 'কৃষি-উদ্যোক্তাদের জন্য' সুদের হার সর্বোর্চ্চ ২ শতাংশ করা উচিত।

আগামী বাজেটে সার্বিক প্রত্যাশা ও পরামর্শ

- স্বাস্থ্যখাতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া, বরাদ্দ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, সকল হাসপাতাল ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা এবং হাসপাতাল বাড়ানো।
- শিক্ষাখাতে ব্যাপক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব, বরাদ্দ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গবেষণায় ব্যাপক উন্নয়ন ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- কৃষিখাতে কৃষিনিভর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা।
- শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন, দরিদ্রদের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- শ্রমজীবীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়ানো।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর দেওয়া, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতে বাজেট বাড়ানো।
- বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা ও কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- অসচ্ছল পরিবারের অন্তত ০১ জনের চাকুরি নিশ্চিত করা।
- বেকারদের জন্যে আলাদাভাবে বরাদ্দ করা।
- যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।
- বেকার সমস্যা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া।

বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু প্রত্যাশা

- জনগণের মতামত মুল্যায়ন করে সর্বস্ড়রের জনগনের জন্য গ্রহণযোগ্য সুষম বাজেট প্রণয়ন;
- হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও প্রান্তিক জনগণের সুরক্ষা, অসহায় মানুষদের সাহায্য করা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ ও আর্থিক অধিকার নিশ্চিত করা;

- দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য উপযোগী বাজেট প্রণয়ন ও দ্রব্যমূল্য কমানো।
- সকল খাতে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া, বাজেটে করের পরিধি বাড়ানো কিন্তু বাজেট বিলাসিতা করতে গিয়ে সাধারণ জনগণকে ভ্যাটের যাতাকলে না ফেলা।
- প্রতিটি সেক্টরে বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দুর্নীতি দূর করা ও দুর্নীতিমুক্ত বাজেট বাস্তবায়ন এবং বাজেটের জবাব-দিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- নির্ধারিত খাতে সততার সাথে গুণগত ব্যয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখা; জনপ্রশাসন খাতে আরো নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।

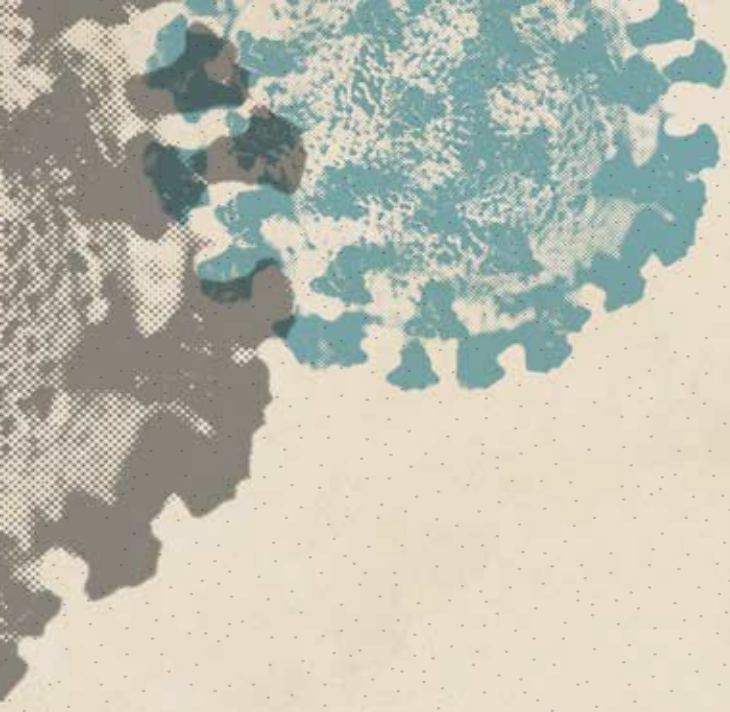

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

Democratic Budget Movement

সামাজিক সুরক্ষায় অর্থায়ন